।। দ্বিতীয় অধ্যায় ।।

নরেন্দ্রনাথ মিত্রের সংক্ষিপ্ত জীবনভাষ্য

লেখকের মনোধর্মের ছাপ পড়ে তাঁর রচনায় আর তাঁর মনোধর্ম গঠিত হয় তাঁর বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে। জন্মভূমি থেকে জন্মকাল, বিচরণভূমি ও বিচরণকাল, কর্মভূমি ও কর্মকাল, এ সকলই গঠন করে তাঁর মানসধর্মকে। এই কারণেই এই অধ্যায়ে নরেন্দ্রনাথ মিত্রের ব্যক্তি জীবনে আলোকপাতের চেষ্টা করা হয়েছে। এই অধ্যায়ে নরেন্দ্রনাথের সংক্ষিপ্ত ব্যক্তি জীবন বর্ণনার উদ্দেশ্য মানুষটির কিছু ব্যক্তিগত পরিচয় নেওয়া তো বটেই, কিন্তু মূল উদ্দেশ্য সেই সকল ঘটনার উল্লেখ করা যা তাঁর জীবনে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেছিল, অর্থাৎ সেই সকল ঘটনা কীভাবে নরেন্দ্রনাথের মতো ছোটগল্পকারের জীবনচেতনাটি গড়ে তুলেছিল তার খোঁজ করা। জীবনের অভিজ্ঞতা থেকেই লেখক গল্প রচনা করেন কিন্তু তাতে থাকে কল্পনার আস্তরণ, চোখে দেখা চরিত্রের উপরে আপন মনের মাধুরীর প্রলেপে তৈরি হয় গল্পের ভুবন। সুতরাং মূলের সেই চোখে দেখা জিনিসটি কী ভাবে সাহিত্যের বিশ্ব নির্মাণে ক্রিয়াশীল তা অনুসন্ধানের আকাঙ্ক্ষাই প্রেরিত করে লেখকের ব্যক্তিজীবনের বর্ণনায়। 'কবিরে পাবেনা তার জীবনচরিতে' - এ কথা সত্য কিন্তু সমগ্র কবিসত্তায় ব্যক্তিজীবন ও তার অভিজ্ঞতার মূল্যকেও তো কোন ভাবে অস্বীকার করা যায় না। নরেন্দ্রনাথ মিত্রের বহু গল্পের বিষয় সৃষ্টি কিংবা রূপ নির্মাণে প্রত্যক্ষভাবে ক্রিয়াশীল তাঁর ব্যক্তি জীবনের বহু ঘটনা ও অভিজ্ঞতা। যেমন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় তিনি সামরিক অর্ডিন্যান্স ফ্যাক্টরিতে সৈনিকদের সরবরাহের জিনিসপত্র পরীক্ষার কাজ পেয়েছিলেন। সেই 'বালতি টেপা'র ঘটনাই প্রত্যক্ষভাবে উঠে এসেছে তার 'নেতা' গল্পে। এ ছাড়াও বহু গল্পে তাঁর ব্যক্তিজীবনের অভিজ্ঞতার প্রত্যক্ষ ছায়াপাত ঘটেছে। এমনকি তাঁর উপন্যাসের ক্ষেত্রেও একথা সমান ভাবে সত্য। 'দ্বীপপুঞ্জ' বা 'দেহমন' উপন্যাসের কথা এ প্রসঙ্গে স্মরণযোগ্য। তাই নরেন্দ্রনাথের জীবনকাহিনির অনুপুঙ্খতা নয়, গভীরতার সন্ধানেই তৎপর তাঁর জীবনকথা বর্ণনা।

নরেন্দ্রনাথ মিত্রের জন্ম ১৯১৬ খ্রিস্টাব্দের ৩০ শে জানুয়ারি, বাংলা ১৬ ই মাঘ, ১৩২৩ বঙ্গাব্দ। জন্মস্থান পূর্ববঙ্গের ফরিদপুর জেলায়। ফরিদপুর শহর থেকে বাইশ মাইল দক্ষিণে সদরদি গ্রাম। এই সদরদি গ্রাম নরেন্দ্রনাথের জন্মস্থান। সদরদি গ্রামের কাছাকাছি শহর ভাঙ্গা। মহকুমা শহর না হলেও জমজমাট ভাঙ্গা শহরে হাটবাজার, হাইস্কুল এবং মুনসেফি আদালত ছিল। এই মুনসেফি আদালতেই নরেন্দ্রনাথের বাবা মহেন্দ্রনাথ মিত্র এবং কাকা, যাকে নরেন্দ্রনাথ মণিকাকা বলতেন, এই দু'জন দুই উকিলের সেরেস্তায় মুহুরীর কাজ করতেন। নরেন্দ্রনাথ ছোটভাই ধীরেন্দ্রনাথ মিত্রের 'আমাদের কথা' রচনা থেকে তাদের সদরদি বাড়ির পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি লেখেন —

"অনেকটা জায়গা নিয়ে বাড়ি। চারপোতায় চারখানা বড়ো টিনের ঘর। ভিতর বাড়ি, বার বাড়ির বড়ো বড়ো দুটো উঠোন। বাড়ির পিছনে একটা বাঁশঝাড়। পূর্ব দিকে পুকুর। পুকুরের চারপাশে ঘিরে কয়েকটা খেজুর গাছ ছিল। বাড়ি থেকে খানিকটা হেঁটে গেলেই কুমার নদী। বর্ষার সময় কুমারের জল খাল বেয়ে বাড়ির কাছে চ'লে আসত। তখন নৌকা ছাড়া যাতায়াতের কোন উপায় থাকত না।'[১]

এই জন্মস্থান নরেন্দ্রনাথের উপর গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিল। কুমার নদীর সৌন্দর্য, কুমার নদীর নামের শ্রুতিমাধুর্য, পূর্ববাংলার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ও প্রকৃতির কোলে বেড়ে ওঠা সহজ সরল মানুষের সরল জীবনযাত্রা ও জটিল জীবন সংগ্রামকে তিনি সহজ সাবলীলতায় প্রকাশ করেছেন। এই জন্মভূমি ও জন্মস্থানের প্রভাব নরেন্দ্রনাথের উপর ক্রিয়াশীল ছিল এবং তার সর্বাধিক পরিচয় ছড়িয়ে আছে তাঁর প্রথম দিকের ছোটগল্পগুলিতে, যেখানে গল্পের পরিবেশ ও প্রতিবেশ রচনায় অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রাধান্য পেয়েছে পূর্ববঙ্গ ও পূর্ববঙ্গের পল্লীপ্রকৃতি। এই বক্তব্যের সমর্থনে 'চাঁদমিঞা' (১৩৫৩), 'রস' (১৩৫৪), 'পালঙ্ক' (১৩৫৯) প্রভৃতি ছোটগল্পের নাম উল্লেখ করা যায়।

নরেন্দ্রনাথের নিজস্ব স্মৃতিচারণাতেও জন্মস্থান সদরদি গ্রামের চিত্র ফুটে উঠেছে প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের অনুপুঙ্খতায়—

"..... পশ্চিম দিকে একটি ছোট নদী কুমার। ..... পশ্চিমে নদী আর পূর্বে দিগন্ত বিস্তৃত মাঠ। সেই মাঠের ধার ঘেঁষে চাষী গৃহস্থদের বাড়ি। বাড়ির পরেই শস্য ক্ষেত। ধান পাটের সবুজ সমুদ্র। বর্ষায় এই মাঠও তলিয়ে যেত। প্রান্তর হয়ে যেত সায়র।"[২]

জন্মস্থানের এই পল্লীপ্রকৃতি নরেন্দ্রনাথের রচিত ছোটগল্পের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর কিছু উপন্যাসেরও প্রতিবেশকে গঠন করেছে। তাঁর 'দ্বীপপুঞ্জ' উপন্যাসটি পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়েছিল ১৩৫৩ বঙ্গাব্দে। তবে এর পূর্বে এটি দেশ পত্রিকার পাতায় কার্তিক, ১৩৪৯ থেকে ফাল্গুন ১৩৪৯ এর মধ্যে 'হরিবংশ' নামে ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হয়েছিল। এই উপন্যাসের পটভূমি সম্পর্কে তিনি বলেন—

"হরিবংশে আমাদের সদরদি গ্রামের অনেকেই এসে ভিড় করেছিল। আমাদের মধ্যপাড়ার উত্তরে ছিল সাহাপাড়া। ..... আমাদের গ্রামের সাহা সম্প্রাদায়ের অনেকেরই দোকানপাট ছিল সেই ভাঙ্গা শহরে। কেউ বড় দোকানের মালিক, কারো দোকান ছোট ছোট। কারো বা দোকানঘর আছে, গুদাম ঘর আছে, কেউ বা বাজারের মধ্যেই চট বিছিয়ে বসে যায়। .... সেই সাহা পাড়ার অনেকেই এসে ভিড় করেছিলেন আমার প্রথম উপন্যাসে।"[৩]

প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায় 'দ্বীপপুঞ্জে'র অন্যতম প্রধান চরিত্র সুবল সাহা, গঞ্জের মাটিতে চট বিছিয়ে হলুদ, শুকনো লঙ্কা বিক্রি করে। আবার গ্রামের মোড়লস্থানীয় নবদ্বীপ সাহা কুমারগঞ্জের বড় ব্যবসাদার। তামাকের বড় গুদাম আছে তার। তবে বাস্তবের ভাঙ্গা শহরের নাম উপন্যাসে হয়েছে কুমারগঞ্জ।

এই নামকরণেও সম্ভবত প্রভাব পড়েছে কুমার নদীর। নরেন্দ্রনাথের স্মৃতি বিজড়িত কুমার নদীর তীরবর্তী বলেই হয়ত শহরের নাম কুমারগঞ্জ।

জন্মের কিছুকালের মধ্যেই নরেন্দ্রনাথের জীবনে একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটেছিল। তাঁর মা বিরাজবালা নরেন্দ্রনাথের শিশু বয়সেই মারা যান এবং তিনি ও তাঁর ভাই ধীরেন্দ্রনাথ তাঁর 'বড়-মা'র কাছে পালিত হন। এই 'বড়-মা' হলেন জগৎমোহিনী দেবী। জগৎমোহিনী দেবী নরেন্দ্রনাথের পিতা মহেন্দ্রনাথের প্রথম পত্নী। তিনি পরপর ছয়টি কন্যা সন্তানের জন্মদান করেন। কিন্তু তারা কেউই এক-দেড় বছরের বেশি বেঁচে থাকেনি। এই কারণে মহেন্দ্রনাথকে দ্বিতীয়বার বিবাহ দেওয়া হয় বিরাজবালার সঙ্গে। এই বিষয়ে নরেন্দ্রনাথ মিত্রের পুত্র অভিজিৎ মিত্রের লেখা 'বিরাজবালার উত্তরাধিকার' থেকে জানা যায়—

"আমার বাবার দুই মা। আমারা যে ঠাকুমাকে দেখেছি অর্থাৎ জগৎমোহিনী, তিনি ঠাকুরদার প্রথমা স্ত্রী। দুর্ভাগ্যবশত তিনি মৃতবৎসা হওয়ায় ঠাকুরদার ঠাকুরদা অর্থাৎ শ্রীনাথ মিত্র এবং ঠাকুরদার পিসি ঠাকুরদাকে দ্বিতীয় বিবাহ দেওয়ার জন্য আগ্রহী হন।"[৪]

শ্রীরামপুরে কাজের সূত্রে গেলে যে বাড়িতে মহেন্দ্রনাথ আতিথেয়তা গ্রহণ করতেন, সেই বাড়ির মালিকের ভাগনী ছিলেন বিরাজবালা। নরেন্দ্রনাথ ও ধীরেন্দ্রনাথ এই বিরাজবালার গর্ভেই জন্মগ্রহণ করেন। বিরাজবালা যখন অকালে মারা যান তখন নরেন্দ্রনাথ ও ধীরেন্দ্রনাথ খুবই ছোট ফলে তাদের মানুষ করবার ভার পরে জগৎমোহিনীর উপর এবং তিনিই তাদের মানুষ করেন। ধীরেন্দ্রনাথের রচনা অনুযায়ী বিরাজবালার মৃত্যুর সময় নরেন্দ্রনাথের বয়স চার বছর। 'আমাদের কথা' রচনায় ধীরেন্দ্রনাথ লেখেন—

"আমাদের আপন মা যখন মারা যান তখন আমরা খুব ছোট, দাদার তখন চার বছর বয়স। মার কথা দাদার কিছু কিছু মনে পড়ত, আমার কিছুই মনে নেই। আমরা বড়োমার কাছে মানুষ হয়েছি।"[৫]

অবশ্য নরেন্দ্রনাথের পুত্র অভিজিৎ মিত্র লেখেন— "বাবার দুবছর বয়সে বিরাজের মৃত্যু হয়।"[৬] নরেন্দ্রনাথের জন্মের পর বিরাজবালার একটি কন্যা ও একটি পুত্র সন্তান জন্মায় তারপর তিনি মারা যান। সেই হিসেবে বিরাজবালার মৃত্যুকালে নরেন্দ্রনাথের বয়স দুই বৎসর অপেক্ষা ধীরেন্দ্রনাথ কথিত চার বৎসর হওয়ার সম্ভাবনাই অধিক।

বিরাজবালা নরেন্দ্রনাথ ও ধীরেন্দ্রনাথের গর্ভধারিণী হলেও সংসারে জগৎমোহিনী ও বিরাজবালার অধিকার সমান ছিল না। জগৎমোহিনীর পক্ষে তা ছিল 'বার আনা - চার আনি' ভাগ। "কিন্তু বিরাজ তা নিয়ে ঝগড়া বিবাদ তো দূরের কথা কোনদিন কোনো কথা বলেননি।"[৭] জগৎমোহিনীর কোলে বিরাজবালার মৃত্যু ঘটে। তাদের বাড়িতে বিরাজবালার কোনো চিহ্ন বা ছবি কিছুই ছিল না। নরেন্দ্রনাথ ও ধীরেন্দ্রনাথ বাল্যকালে জগৎমোহিনীকেই মা বলে জানতেন।

নরেন্দ্রনাথের জীবনে তাঁর বাবার প্রভাব অত্যন্ত অধিক পরিমাণে পড়েছিল। তাঁর পিতা দীর্ঘকায় স্বাস্থ্যবান পুরুষ মহেন্দ্রনাথ কেবল বিষয়ী ছিলেন তাই নয়, অন্যান্য অনেক বিষয়ে তিনি দক্ষতা অর্জন করেছিলেন। অতি অল্পবয়সেই তিনি বৃহৎ সংসারের দায়িত্ব নিজের কাঁধে নিয়েছিলেন। এই দায়িত্ব গ্রহণের জন্যই তার পড়াশুনো বেশি দূর এগোয়নি, তিনি উচ্চ প্রাইমারি পর্যন্ত পড়েছিলেন। তবে তিনি ভালো অঙ্ক জানতেন। নরেন্দ্রনাথের ম্যাট্রিকের অঙ্কও তিনি কষে দিতেন। এছাড়া তিনি ছিলেন শিল্পরসিক, প্রথাগত শিক্ষা না থাকলেও মার্গসঙ্গীতে তাঁর দখল ছিল; রজনীকান্ত ও অতুলপ্রসাদের গানও তিনি গাইতেন। তিনি অভিনয়ও করতে পারতেন। সাহিত্যপ্রিয় এই মানুষটির প্রিয় লেখক ছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র ও শরৎচন্দ্র। এছাড়া বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের পদাবলী থেকেও তিনি রসাস্বাদন করতেন।

মহেন্দ্রনাথ ভাঙ্গা শহরে এক উকিলের সেরেস্তায় মুহুরীর কাজ করতেন। চিঠিপত্র, দলিল দস্তাবেজের মুসাবিদায় তিনি ছিলেন পারদর্শী। তাঁর সেরেস্তার উকিলেরাও তাঁর উপরে অনেকাংশে নির্ভর করতেন। এই রকম বহুকর্মা পিতা নরেন্দ্রনাথের উপর গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিলেন। নরেন্দ্রনাথ লেখেন — "সবচেয়ে জীবন্ত প্রাণবান পুরুষ ছিলেন আমার বাবা। এমন পুরুষ মূর্তি আমি আর জীবনে দেখিনি।"[৮] কিন্তু নরেন্দ্রনাথ ছিলেন তাঁর পিতার থেকে সম্পূর্ণ বিপরীত প্রকৃতির। এই নিয়ে পিতা-পুত্র উভয়েরই দুঃখের অন্ত ছিল না। 'আত্মকথা'য় নরেন্দ্রনাথ লেখেন — "আমি বাবার মত হইনি এ সম্বন্ধে ছেলেবেলা থেকেই আমি সচেতন ছিলাম। আমার চারিদিকের উচ্চারিত অনুচ্চারিত মন্তব্য আর মনোভাব আমাকে সচেতন করে তুলেছিল। বাবা ছিলেন আটপিঠে মানুষ। দরকার হলে যেমন কোদাল কুড়ুল চালাতে পারতেন তেমনি কলম চালাতেও তাঁর ক্লান্তি ছিল না। কিন্তু গায়ের ছেলে হয়েও আমি না পারি গাছে উঠতে। না পারি নৌকা বাইতে।"[৯] পিতা ও পুত্রের এই বৈপরীত্য সম্পর্কে তিনি নিজে যেমন সচেতন ছিলেন, তেমনি পরিবারের অন্যান্যরাও এ বিষয়ে অবগত ছিলেন। নরেন্দ্রনাথের মামীমা একবার নরেন্দ্রনাথের পিতাকে নরেন্দ্রনাথের স্বভাবগত বৈশিষ্ট্যের কথা বলায় মহেন্দ্রনাথ অন্তরে কষ্ট পেয়েছিলেন। নরেন্দ্রনাথের স্মৃতিচারণে এই ঘটনার উল্লেখ আছে—"শুনে বাবার মুখখানি মুহূর্তের জন্য ম্লান হয়ে গিয়েছিল। পরক্ষণেই তিনি হেসে বলেছিলেন, 'বউঠান একজন কি আর একজনের মত হয়?' "[১০]

নরেন্দ্রনাথ যেমন পিতার গৌরবে গৌরব বোধ করতেন তেমনি পিতাও তাঁকে অত্যন্ত ভালবাসতেন। তবে তিনি নিজে পিতার মতো নন বলে নরেন্দ্রনাথের আফশোষ থেকে গেছে চিরকাল। তাঁর নিজের ভাষায়—

"এই কোমল কঠিনে গড়া একই সঙ্গে বিষয়বুদ্ধি আর শিল্পবুদ্ধিতে সমৃদ্ধ বহুকর্মা পুরুষটির প্রায় কিছুই আমি পাইনি। না তাঁর আকার না তাঁর প্রকৃতি। শুধু সাহিত্য প্রীতি, শুধু যৎসামান্য লেখার শক্তি। শুধু নিজের যন্ত্রণাকে ভাষায় ব্যক্ত করবার কথঞ্চিৎ ক্ষমতা। এই আমার উত্তরাধিকার।"[১১]

বাল্যকালে নরেন্দ্রনাথের উপর প্রভাব বিস্তার করেছিল আরেকজন কীর্তিমান পুরুষ, তিনি মহেন্দ্রনাথের সম্পর্কিত মামা - নরেন্দ্রনাথ যাকে ডাকতেন 'চাকলাদার ঠাকুরদা'। তার পুরো নাম অবিনাশচন্দ্র চাকলাদার। নরেন্দ্রনাথের বাল্যকালেই এই ঠাকুরদা সপরিবারে তাঁদের পরিবারভুক্ত হন। প্রয়োজন ও অপ্রয়োজনীয় বহু বিষয়ে তাঁর দক্ষতা ছিল। বহু বিষয়ে দক্ষতা থাকলেও তার বিষয়বুদ্ধি ছিল না। সংসারের আর পাঁচজনের সঙ্গে তাঁকে মেলানো যেত না বলেই এই ঠকুরদার প্রতি ছিল নরেন্দ্রনাথের অপ্রতিরোধ্য আকর্ষণ ও অন্তরঙ্গ সহানুভূতি। 'কিশোর গল্প সমগ্র' গ্রন্থে সংকলিত গল্প গুলিতে নরেন্দ্রনাথ এই ঠাকুরদাকে অমর করে রেখেছেন। এছাড়া অন্যান্য অনেক গল্পেই এই চরিত্রের ছায়াপাত ঘটেছে। এই চাকলাদার ঠাকুরদার কাঠের বাক্সের থেকে পাওয়া রামায়ণ, মহাভারত, বঙ্কিমচন্দ্রের গ্রন্থাবলী, নবীন সেনের 'পলাশীর যুদ্ধ' এবং আরও প্রচুর গ্রন্থ কিশোর নরেন্দ্রনাথকে ছোটবেলায় সাহিত্যরস আস্বাদনের সুযোগ করে দিয়েছিল এবং এইসব গ্রন্থপাঠ করেই নরেন্দ্রনাথ কিশোর বয়সে সাহিত্য রচনার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন। চাকলাদার ঠাকুরদার এই গ্রন্থগুলি নিয়ে তিনি প্রথম তাঁদের বাড়িতে একটি লাইব্রেরি তৈরি করেন। এই গ্রন্থাগার প্রীতি নরেন্দ্রনাথের আমৃত্যু ছিল। জীবনের শেষ বেলায় এসেও তিনি তাঁদের পাড়ার সুহৃদ-সংঘ লাইব্রেরিকে গড়ে তোলার জন্য পরিশ্রম করেছেন। এই চাকলাদার ঠাকুরদার কাঠের বাক্সে 'গয়াসুরের হরিপাদপদ্ম লাভ' নামে আদি-অন্ত খণ্ডিত একটি পৌরাণিক নাটক নরেন্দ্রনাথ পেয়েছিলেন। এই নাটকের অনুসরণে তিনি একটি নাটক লিখতে শুরু করেছিলেন। অতএব স্পষ্টতই বলা যায় নরেন্দ্রনাথের লেখক হয়ে উঠার পিছনে চাকলাদার ঠাকুরদার একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব রয়ে গেছে।

নরেন্দ্রনাথের বাল্য ও কৈশোরকালে তাঁর থেকে কুড়ি বছরের বড় জ্যাঠতুতো দাদা বিরূপাক্ষ তাঁকে সাহিত্য রচনায় উৎসাহিত করেছিলেন। বংশের প্রথম ম্যাট্রিকুলেট বড়দা বিরূপাক্ষই নরেন্দ্রনাথ ও ধীরেন্দ্রনাথকে সাহিত্যের প্রথম পাঠ দেন। ধীরেন্দ্রনাথ লেখেন—"বড়দার কাছেই আমাদের সাহিত্যের প্রথম পাঠ।"[১২] ছুটিতে বড়দা বাড়িতে আসলে তাঁর কাছে নরেন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথের গান, রবীন্দ্রনাথের কবিতা, শরৎচন্দ্রের রচনা শুনতেন। বিরূপাক্ষ ছিলেন বিদেশি উপন্যাসের ভক্ত, তিনি ভাইদের বিদেশি উপন্যাসের কাহিনি মুখে মুখে শোনাতেন। ধীরেন্দ্রনাথের লেখা থেকে জানা যায় এই বড়দার মুখেই তাঁরা দস্তয়েভস্কির 'ক্রাইম অ্যান্ড পানিশমেন্ট' উপন্যাসের গল্প শুনেছিলেন। পত্রবিলাসী বড়দা নরেন্দ্রনাথকে উৎসাহিত করতেন সাহিত্য রচনার প্রতি। বলেছিলেন — "আমি শুধু চিঠিতেই সাহিত্যচর্চা করে গেলাম। তার বেশি আর এগোল না। তুমি লিখছ। আরো লিখবে, তুমি হবে আমাদের বংশের প্রথম লেখক।"[১৩] নরেন্দ্রনাথ যখন ক্লাশ এইটে পড়েন তখন এই বড়দা যৌথ পরিবার থেকে পৃথক হয়ে যান। এই সময় এই ঘটনাকে ঘিরে বাড়িতে একটু বাদ বিসংবাদের সৃষ্টি হয়। এই সময়কার দৈনন্দিন বাদ-প্রতিবাদের বিবরণ নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে লিপিবদ্ধ করবার প্রয়াস করেছিলেন নরেন্দ্রনাথ। এই প্রচেষ্টাও তাঁর লেখক হয়ে ওঠার

পথকে সুগম করেছিল বলে তিনি মনে করতেন। পারিবারিক আবহের আনুকূল্য ও পারিবারের সদস্যদের প্রেরণা— এই যুগপৎ দিকই তাকে লেখক হয়ে উঠতে উৎসাহিত করেছিল, শুধু তাই নয় তিনি তাঁর কৈশোর গল্পের চরিত্রের সন্ধানও করেছিলেন পরিবারের গণ্ডির মধ্যে। নরেন্দ্রনাথের এক জ্যাঠতুতো দিদি ছিলেন, তার স্বামী স্বদেশী করতেন। এই দিদি ও জামাইবাবুকে নিয়েই নরেন্দ্রনাথ রচনা করেছিলেন তাঁর প্রথম গল্প।[১৪]

নরেন্দ্রনাথের বাল্যশিক্ষার শুরু অক্ষয়কুমার শীলের কাছে। সদালাপী ও কীর্তন গানে পটু এই বাল্যশিক্ষকের রূঢ়তাকে বর্জন ক'রে তিনি 'দ্বীপপুঞ্জ' উপন্যাসের বিনোদ চরিত্র অঙ্কন করেছেন। আত্মভোলা কীর্তনীয়া বিনোদকে রূপ লাবণ্যময় ক'রে গড়ে তিনি কুরূপ বাল্যশিক্ষককে গুরুদক্ষিণা দিয়েছিলেন।

পূর্বেই বলা হয়েছে, নরেন্দ্রনাথের সাহিত্য রচনার সূত্রপাত বাল্যকালেই। অমুদ্রিত এই প্রস্তুতি পর্বে তাঁর একজন সাহিত্য সঙ্গী ছিলেন তাঁদের প্রতিবেশী দিগিন্দ্রনাথ রাহা। বয়সে অনেক বড় হলেও সাহিত্য অনুরাগী এই দিগেনকাকা, নরেন্দ্রনাথের সমমনস্ক ছিলেন। নরেন্দ্রনাথ স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে লেখেন—

"বঙ্কিমচন্দ্র শরৎচন্দ্রের গ্রন্থাবলী থেকে পছন্দমত অংশগুলি তিনি পড়ে পড়ে শোনাতেন। পঠিত বিষয় নিয়ে আলাপ করতেন আলোচনা করতেন। চাকলাদার ঠাকুরদা আর আমি সেই আলোচনায় সাগ্রহে যোগ দিতাম।"[১৫]

ভাঙ্গা হাইস্কুলে নবম শ্রেণিতে পড়বার সময় বন্ধুদের সঙ্গে মিলে নরেন্দ্রনাথ প্রকাশ করেছিলেন হাতে লেখা পত্রিকা 'আহ্বান'। এই পত্রিকার পাতাতেই তিনি লিখতে শুরু করেছিলেন ধারাবাহিক উপন্যাস 'মুক্তার হার'। কাগজের পঞ্চত্ব প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে সেই 'মুক্তার হার'ও হারিয়ে যায়। একই সময়ে ভাই ধীরেন্দ্রনাথ, খুড়তুতো ভাই হেমেন্দ্র ও বন্ধু কৃষ্ণদাস বৈরাগীকে নিয়ে প্রকাশ করেছিলেন আরেকটি হাতে লেখা পত্রিকা 'মাসিক মুকুল'। নরেন্দ্রনাথ স্বয়ং ছিলেন এই পত্রিকার সম্পাদক। বাল্যকালের এই সব আপাত অকিঞ্চিৎকর অথচ লেখক হিসেবে গড়ে উঠবার ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সাহিত্যপ্রচেষ্টাগুলি আরও পরিণতি ও গভীরতা লাভ করে ফরিদপুর রাজেন্দ্র কলেজে পড়বার সময় সাহিত্যিক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়কে সমবয়স্ক বন্ধু ও সাহিত্যসঙ্গী হিসেবে লাভ ক'রে।

কবিপ্রাণতা ও শিল্পিমানসিকতা নরেন্দ্রনাথের বাল্যকাল থেকেই ছিল। শিল্পি মানুষদের সঙ্গে তিনি একাত্মতা অনুভব করতেন এবং এই মানুষেরা অনেকেই তাঁর রচিত ছোটগল্পের চরিত্র হয়ে উঠেছে। এ বিষয়ে তাঁর স্বীকারোক্তি এই রকম— "সেই অল্প বয়স থেকেই গ্রামের যারা নানা মাধ্যমের শিল্পী তাদের সঙ্গে আমি এক ধরনের আত্মীয়তা বোধ করতাম। তাদের আমি সমাদর করতাম। তাদের সঙ্গ আমার ভালো লাগত। সবাইকে পারিনি কিন্তু তাদের কাউকে আমি লেখার মধ্যে ধরে রাখতে চেষ্টা

করেছি।"[১৬]

১৯৩৩ সালে ফার্স্ট ডিভিসনে ম্যাট্রিক পাশ ক'রে নরেন্দ্রনাথ ফরিদপুর রাজেন্দ্র কলেজে ভর্ত্তি হন। এখানেই নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়। রেসিডেন্সিয়াল টিউশনি ক'রে ফরিদপুরে নরেন্দ্রনাথ থাকতেন। তবে টিউশনিতে তিনি সুনাম অর্জন করতে পারেননি। কোমল স্বভাবের জন্য তিনি ছাত্রদের মান্যতা পেতেন না, তাছাড়া অন্যের বাড়িতে ছাত্র পড়িয়ে বাস করবার গ্লানি তাকে স্পর্শ করতো। তাঁর স্মৃতিচারণা ও রচনাতে ফরিদপুরের স্মৃতি হয়তো এই কারণেই আশ্চর্যরকম কম বা স্পষ্টত নেই। তবে এই ফরিদপুরে কলেজে পড়বার সময়ই নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের সঙ্গে মিলিত ভাবে একটি হাতে লেখা মাসিক পত্র প্রকাশ করেছিলেন। এই পত্রিকার নাম ছিল 'জয়যাত্রা'। এই পত্রিকায় 'নিখিলের চিঠি' নামে একটি পত্রোপন্যাস রচনা শুরু করেন নরেন্দ্রনাথ। এ বিষয়ে সমালোচক লেখেন—

"অল্প বয়সেই অভিনব শিল্পরীতির দিকে লেখকের আকর্ষণ গড়ে উঠেছিল এই পত্রোপন্যাসই তার প্রমাণ।"[১৭]

'জয়যাত্রা' ব্যতীত, ফরিদপুরে কলেজে পড়বার সময়েই সত্যেন্দ্রনাথ রায়, অচ্যুত গোস্বামী, অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়, রণেন মজুমদার,শান্তিপ্রিয় ঘোষ প্রমুখের সঙ্গে মিলিতভাবে আরেকটি হাতে লেখা কাগজ তিনি প্রকাশ করেছিলেন এই পত্রিকার নাম ছিল 'অভিসার'। বন্ধুবর্গের মধ্যে বয়জ্যেষ্ঠ শান্তিপ্রিয় বাবু ছিলেন এই পত্রিকার সম্পাদক। সম্পাদক মহাশয় 'শ্যামলী সেন' নামে এক 'কল্পিতা সঙ্গিনীকে'ও তাদের গোষ্ঠীভুক্ত করেছিলেন। দু'তিন সংখ্যার বেশি প্রকাশিত না হলেও এই 'অভিসার' পত্রিকায় নরেন্দ্রনাথেরা সাহসী সব লেখা প্রকাশ করতেন। নরেন্দ্রনাথের ভাষায়— "সেই অভিসার পত্রিকায় আমাদের সব দুঃসাহসিক লেখা বেরোত। আর সমালোচনাও হত তীব্র রকমের। আমরা উপভোগ করতাম।"[১৮]

মোটামুটিভাবে এ হল নরেন্দ্রনাথের সাহিত্য জীবনের 'অমুদ্রিত প্রস্তুতিপর্ব'। ১৯৩৫ সালে ফরিদপুর থেকে নরেন্দ্রনাথ প্রথম বিভাগে আইন পাশ করেন, এরপর তিনি বি.এ. পড়তে কলকাতায় এসে বঙ্গবাসী কলেজে ভর্ত্তি হন। ফরিদপুর তার মনে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করতে পেরেছিল বলে মনে হয়না, ফরিদপুরের স্মৃতি তার পরবর্তী সাহিত্য জীবনে নেই বললেই চলে। এ বক্তব্যের সমর্থনও পাওয়া যায় তাঁর ভাই ধীরেন্দ্রনাথ মিত্রের লেখায়— "...ফরিদপুর দাদার মনের ওপর বেশি ছাপ ফেলতে পারেনি। তাঁর লেখায় সদরদি, ভাঙার কথা যতটা এসেছে, সে তুলনায় ফরিদপুরের কথা কিছুই আসেনি।"[১৯]

বঙ্গবাসী কলেজে বি.এ. ক্লাশে পড়বার সময় তার লেখা প্রথম প্রকাশিত হয়। ১৯৩৬ সালে 'দেশ' পত্রিকায় প্রকাশিত এই লেখাটি একটি কবিতা, নাম— 'মূক'। যদিও আমাদের আলোচনার বিষয় নরেন্দ্রনাথের ছোটগল্প তথাপি তাঁর এই কবিতা সম্পর্কে একটু আলোচনা করা যেতে পারে, কারণ

ছোটগল্পকার হিসেবে লেখকের মেজাজটি বুঝে নিতে এই লেখাটি সহায়তা করে। কবিতা সম্পর্কে তিনি বলেন— "কবিতা যতই দুর্বল, আর সমকালের তুলনায় রীতির দিক থেকে পুরাকালের হোক না তার মধ্যে ব্যক্তিসত্তাকে যেভাবে ঢেলে দেওয়া যায় তেমন আর কোন রচনায় যায় না।"[২০] তাঁর এই বক্তব্য থেকে স্পষ্ট, নিজের কবিতার রীতি যে সমকালীন ধারা অপেক্ষা একটু পশ্চাদানুসারী সে সম্পর্কে তিনি সচেতন। অন্যদিকে আরেকটি বিষয় এ থেকে জানা যায় যে তিনি কবিতায় নিজের ব্যক্তিসত্তাকে ঢেলে দিতে স্বচ্ছন্দ বোধ করতেন। এখন তাঁর প্রথম মুদ্রিত 'মূক' কবিতা থেকে দুটি চরণ উদ্ধার করা যাক। এই কবিতার শেষ দুটি চরণ এই রকম-

"শুধু কি ভালোবাসা পাবে না কভু ভাষা
গুমরি মরি যাবে আপন হৃদিমাঝে ?"

ভাষা ও ছন্দগত দিক থেকে এ কবিতা যে আধুনিকতার পরিচয়বাহী নয় তা স্পষ্টই অনুভব করা যায়। কিন্তু তা সত্ত্বেও এ রীতি তার নিজস্বতাকে প্রকাশ করে। যে সময় এই কবিতাটি লেখা হয়েছে অর্থাৎ ১৯৩৪ সাল (প্রকাশ ১৯৩৬) সে সময়ে কবিতার জগৎটি বর্তমানের মত ছিলনা। গদ্যছন্দের ব্যবহার ও অন্যান্য আধুনিকতার ছোঁয়া তখন কবিতার গায়ে লাগতে শুরু করেছে। সমালোচকের ভাষায়— "বাংলা কবিতায় তখন বাজারচলতি ফ্যাশান হল নজরুল ইসলামের দ্রোহবাদ, মোহিতলাল মজুমদারের দেহবাদ, যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের দুঃখবাদ।"[২১] অতএব স্বাভাবিক ভাবেই দেখা যায় নরেন্দ্রনাথ প্রচলিত কাউকে অনুসরণ করেননি, আধুনিকতার ছোঁয়া হয়ত তিনি কবিতায় দিতে পারেননি কিন্তু নিজের মানসিকতার বিপরীতে গিয়ে সেই বাজার চলতি ফ্যাশানকেও গ্রহণ করেননি। তিনি নিজের পথ নিজেই খোঁজার চেষ্টা করেছেন, তাঁর কবিতা ভাল কি মন্দ, আধুনিক কি অনাধুনিক তা বিচারে না গিয়েই বলা যায় তাঁর কবিতার রীতি তাঁর নিজস্ব। এই নিজস্বতাই হয়ত বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়কে উৎসাহিত করেছিল নরেন্দ্রনাথের কবিতা প্রকাশে। যদিও বিজয়লালের নিজের কবি মানসিকতার সঙ্গে নরেন্দ্রনাথের কবি মেজাজের মিল ছিলনা। নরেন্দ্রনাথের কবিতার নির্বাচক 'দেশ' পত্রিকার সম্পাদক বিজয়লালের নিজের কবিতার বই 'সর্বহারার গান' ব্রিটিশ সরকার বাজেয়াপ্ত করেছিল রাজদ্রোহের অপরাধে। অথচ এই বিজয়লালই নরেন্দ্রনাথের কবিতা পছন্দ করতেন। এর সমর্থন পাওয়া যায় নরেন্দ্রনাথের নিজের লেখায়—"তখন বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায় দেশের কবিতা বিভাগের সম্পাদনা করতেন। তিনি পরপর আমার আরো অনেক কবিতা ছেপেছিলেন। তাঁর কবিতার মেজাজের সঙ্গে আমার কবিতার মিল ছিলনা। তবু তিনি আমার কবিতা পছন্দ করতেন। আলাপ পরিচয় হওয়ার পর সে-কথা আমাকে বলেছিলেন।"[২২]

এবার দেখা যাক তাঁর লেখা কবিতার বিষয়ভাবনার ক্ষেত্রে কোন মৌলিক দিকটির সন্ধান পাওয়া যায়। তাঁর লেখা প্রথম কবিতার বিষয়বস্তু বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি লেখেন— "কবি যে মেয়েটিকে

ভালোবাসে, তার কাছে বার বার যায়, কিন্তু বলি বলি করেও মনের কথা বলতে পারে না, এই ছিল কবিতাটির বিষয়বস্তু।"[২৩]— এই বিষয়টি যে একটি আধুনিক কবিতার বিষয়বস্তু অপেক্ষা অনেক বেশি একটি ছোটগল্পের বিষয়বস্তু এ সম্পর্কে বোধ করি সকলেই একমত হবেন। রবীন্দ্রনাথ থেকে শুরু ক'রে বহু ছোটগল্পকার এই বিষয়কে অবলম্বন করে গল্পরচনা করেছেন; নরেন্দ্রনাথের গল্পের ভাণ্ডারেও এই বিষয়কে নিয়ে লেখা গল্পের অভাব নেই। 'চিলেকোঠা' গল্পটি এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায়। যদিও তিনি বলেছেন— "যাঁরা কবিতা আর গদ্য দুই-ই লেখেন, তাঁরাই জানেন কবিতা লেখায় আনন্দ কত বেশি।"[২৪] কিন্তু তাঁর কবিতা পড়লে দেখা যায় সেই কবিতাগুলি যেন একটু গল্পের আভাস যুক্ত। অনায়াসেই সেই কবিতাগুলি একটি ক'রে ছোটগল্প হতে পারত। কবিতা ও ছোটগল্পের মাঝখানে যেন তারা দোদুল্যমান হয়ে আছে। নরেন্দ্রনাথ যাই লিখে থাকুন তাঁর প্রবণতা ও প্রতিভা যে আদর্শ ছোটগল্পের সে কথা তাঁর প্রথম মুদ্রিত রচনা থেকেই আন্দাজ করা যায়।

যাইহোক 'মূক' প্রকাশিত হবার বছরই অর্থাৎ ১৯৩৬ সালে 'মৃত্যু ও জীবন' বলে একটি গল্প 'দেশ' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। এই গল্পটিই তাঁর প্রথম মুদ্রিত ছোটগল্প। এরপর নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ও বিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য এই দুই বন্ধুর সঙ্গে একত্রিত ভাবে 'জোনাকি' নামে তাঁর একটি ক্ষুদ্র কাব্য সংকলন প্রকাশিত হয়েছিল। কবি হিসেবে তিনি পরিচিত না হলেও ১৯৫৩ সালেও একক ভাবে তাঁর 'নিরিবিলি' নামে আর একটি কাব্যগ্রন্থও প্রকাশিত হয়েছিল। তবে এর মধ্যে নরেন্দ্রনাথের জীবনে একটি বড় পরিবর্তন হয়েছে তা হল তাঁর বিবাহ। সংসারে ঢুকতে ভয় থাকলেও পিতার আদেশে ১৯৩৮ সালে সদরদি গ্রামের পার্শ্ববর্তী চোমড়দি গ্রামের অবিনাশচন্দ্র ঘোষের জ্যেষ্ঠা কন্যা শোভনা দেবীর সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়।

১৯৩৯ সাল পর্যন্ত নরেন্দ্রনাথ কলকাতায় একাই থাকতেন। ১৯৩৯ সালে ভাই ধীরেন্দ্রনাথ আই এ পাশ করলে নরেন্দ্রনাথ ভাইকে কলকাতায় নিয়ে আসেন। এর পূর্বেই তিনি ৬৬ নম্বরের শোভাবাজার স্ট্রিটের মেসে চলে এসেছেন। এর আগে তিনি রেসিডেন্সিয়াল টিউশনি করেই কলকাতায় বাস করতেন। ধীরেন্দ্রনাথ কলকাতায় এসে দাদাকে আনন্দিতই দেখেছিলেন। কলকাতার নাগরিক জীবন তাঁর ভাল লাগত, ধীরেন্দ্রনাথের লেখায় তার সমর্থন পাওয়া যায়— "কলকাতা দাদার ভালো লাগত। দাদা রহস্য করে বলত, 'বেঁচে থাকতে হলে এক জায়গায় তো থাকতেই হবে। তার জন্যে কলকাতাই সবচেয়ে ভালো জায়গা'।"[২৫] কলকাতায় নগর জীবনকে এই ভালো লাগা থেকেই মনে হয় নরেন্দ্রনাথ তাঁর ছোটগল্পের পটভূমি হিসেবে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কলকাতায় নগর জীবনকে বেছে নিয়েছেন। নাগরিক মধ্যবিত্ত মানুষই তাঁর গল্পের প্রধান চরিত্র আর তাদের সুখ-দুঃখময় জীবনকাহিনি তাঁর গল্পের প্রধান উপাদান।

এই সময় কলকাতায় তিনি জীবনে প্রতিষ্ঠিত হবার লড়াইয়ে রত, লেখালেখির সঙ্গে সঙ্গে চাকরির

চেষ্টা করে যাচ্ছেন। 'দেশ' পত্রিকার পর রবিবাসরীয় আনন্দবাজারে 'সংসার' গল্প প্রকাশিত হবার পর তিনি সম্পাদক মন্মথ সান্যাল মহাশয়ের প্রশংসাবাক্য লাভ করেন।

১৯৩৯ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শুরুতেই নরেন্দ্রনাথ অর্ডিন্যান্স ফ্যাক্টরিতে সৈন্যদের ব্যবহার্য জিনিস পরীক্ষার কাজ পেলেন। কাজের ফাঁকে তিনি সংগ্রহ করতেন গল্প লেখার উপাদান। এই অর্ডিন্যান্স ফ্যাক্টরি থেকেই তিনি তাঁর 'নেতা গল্পের চরিত্রদের সংগ্রহ করেছিলেন। এরপর তিনি দ্বিতীয় চাকরিও পান যুদ্ধের অফিসেই, পারচেজ ডিপার্টমেন্টে কেরাণির চাকরি। এরপর কলকাতায় বোমা পড়লে নরেন্দ্রনাথ ভাইকে নিয়ে দেশে অর্থাৎ সদরদি চলে যান।

১৯৪২ সালে নরেন্দ্রনাথের পিতার মৃত্যুর পর আর্থিক দায়ভার সবটাই তাঁর উপর পড়ায় নরেন্দ্রনাথের জীবনসংগ্রাম কঠোরতর হয়। ৪ নম্বর রামশেঠ রোডের দুখানা ঘরের ভাড়াবাড়িতে তিনি সংসার পাতেন। এই সময় ক্যালকাটা ন্যাশনাল ব্যাঙ্কে কাজ করবার সঙ্গে সঙ্গে তিনি 'প্রত্যহ' নামে একটি ছোটো কাগজের অফিসেও পার্ট টাইম কাজ করতেন, তবু ভাই, স্ত্রী ও দুই শিশু পুত্রকে নিয়ে ছোট্ট সংসারের দারিদ্র্য দূর করা তাঁর পক্ষে সম্পূর্ণভাবে সম্ভব হয়ে উঠত না। এতদ্‌সত্ত্বেও নরেন্দ্রনাথ তাঁর লেখার অভ্যাস বজায় রেখেছিলেন। তাঁর প্রথম উপন্যাস 'দ্বীপপুঞ্জ' পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয় ১৯৪৭ সালে। কিন্তু এই বইটিই 'হরিবংশ' নামে ১৯৪২-৪৩ এ 'দেশ' পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়েছিল। এই উপন্যাসে তাঁর সদরদি গ্রামের অভিজ্ঞতা ও অনেক চরিত্র স্থান লাভ করেছিল আর এই সময়ের অভিজ্ঞতা প্রত্যক্ষভাবে স্থান পেয়েছে তাঁর বহু গল্পে, যেখানে তিনি উদ্বাস্তু অথবা মধ্যবিত্ত শ্রেণির কঠোর জীবনসংগ্রামের চিত্র অঙ্কন করেছেন, 'কাঠগোলাপ', 'পালঙ্ক' প্রভৃতি গল্পগুলির কথা এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য।

ব্যাঙ্ক থেকে নরেন্দ্রনাথ জব্বলপুরে বদলি হলে শোভনাদেবী পুনরায় ভাঙ্গা চলে যান। জব্বলপুরের অভিজ্ঞতা অর্থাৎ বাংলাদেশের বাইরের পটভূমি নরেন্দ্রনাথের 'সহৃদয়া' উপন্যাসে কিছু ব্যবহৃত হয়েছে। এছাড়া 'রত্নাবাঈ' গল্পটিতেও মধ্যপ্রদেশের পটভূমি ব্যবহৃত হয়েছে। ব্যাঙ্কে কাজ করবার অভিজ্ঞতা তিনি তাঁর যে ছোটগল্প গুলিতে ব্যবহার করেছেন তার মধ্যে 'চেক' ও 'হেডমাস্টার' গল্পগুলি উল্লেখযোগ্য।

১৯৪৭ সালে ব্যাঙ্কে ভুলবশত একটি জালচেক পাস করবার দায়ে তাঁর বিরুদ্ধে মামলা হয়। বছর খানেক মামলা চলার পর তিনি নির্দোষ প্রমাণিত হয়ে পুনরায় চাকরিতে যোগদান করেই পদত্যাগ করেন। এই সময় তারাশঙ্কর বন্দোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাশ তাঁকে সাহায্য করেন। তাঁর আত্মকথায় এই বিষয়ের উল্লেখ না থাকলেও এই সময় যে অত্যন্ত উৎকণ্ঠার সঙ্গে তাঁকে কাটাতে হয়েছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। 'বিজয়ী' গল্পের শ্রীবিলাস উকিলের চরিত্রটি হয়তো সেই সময়ের অভিজ্ঞতাজাত।

এই সময় নরেন্দ্রনাথের প্রথম গল্পসংকলন 'অসমতল' (১৯৪৫) প্রকাশিত হয়ে গেছে এবং একজন শক্তিশালী গল্পকারের আর্বিভাব সম্পর্কে পাঠককুল নিঃসংশয় হয়েছে। তবু নরেন্দ্রনাথের জীবনসংগ্রাম সমাপ্ত হয়নি 'কৃষক', 'স্বরাজ' প্রভৃতি কাগজের অফিসে চাকরি ও লেখালেখির দ্বারা জীবিকা অর্জনের চেষ্টায় তিনি তখনও সংঘর্ষ করছেন আর এই সংগ্রাম ও অভিজ্ঞতা থেকে নিজের লেখার উপাদান সংগ্রহ করছেন। যেমন নিবেদিতা লেনে তাঁর মামাশ্বশুর ও মেসোশ্বশুরেরা একত্রে বসবাস করতেন, কিছুটা সেই পরিবারের আদলেই তাঁর 'চেনামহল' উপন্যাসটি রচিত হয়েছে। এছাড়া লিনটন স্ট্রিটের বস্তি বাড়িতে বসবাস কালে তাঁদের সহ ভাড়াটে ছিল দুই বোন। এদের সঙ্গে তাঁদের সম্পর্ক মধুর ছিল না, এদের বড় বোনকেই 'দেহমন' উপন্যাসে প্রধান চরিত্র 'রুবি'র ভূমিকায় তিনি অঙ্কন করেছেন।

১৯৫১ সালে আনন্দবাজার পত্রিকায় চাকরি পান নরেন্দ্রনাথ, তারপর ১৯৫৩ সালে পাইক পাড়ায় স্থায়ী ভাবে বসতি স্থাপন করেন। অর্থনৈতিক ভাবে সুস্থিতির সঙ্গে সঙ্গে কলকাতায় স্থায়ী আশ্রয়ও লাভ করেন এবং আমৃত্যু সাহিত্য সাধনা করতে থাকেন। ১৯৭৫ এর ১৪ই সেপ্টেম্বর রাতে হৃৎ-যন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে যাওয়ায় তাঁর মৃত্যু ঘটে। মৃত্যুর দিন সকালেও তিনি 'মিনিবাস' নামে একটি ছোটগল্প পত্রিকার অফিসে নিজে দিয়ে এসে ছিলেন। উনষাট বছরের জীবৎকালে তিনি লিখে গেছেন পঁয়ত্রিশটি উপন্যাস ও চার শতাধিক ছোটগল্প যা বাংলা সাহিত্যের অমূল্য রত্নরাজি বলে বিবেচিত।

এই অধ্যায়ে অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত আকারে নরেন্দ্রনাথের জীবনভাষ্যটি আলোচনা করা হল। এই জীবনভাষ্যটি কীভাবে নরেন্দ্রনাথের মতো একজন সংবেদনশীল ছোটগল্পকারের জীবনবীক্ষাটি নির্মাণ করেছিল তা পরবর্তী অধ্যায়ে দেখানো হবে।

উল্লেখপঞ্জি

১. ধীরেন্দ্রনাথ মিত্র ঃ 'আমাদের কথা', 'প্রসঙ্গ ঃ নরেন্দ্রনাথ মিত্র', সম্পাদনা - সমীর বসু, পদক্ষেপ সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ, জানুয়ারি ২০০১, পৃষ্ঠা - ৩.

২. নরেন্দ্রনাথ মিত্র ঃ 'আত্মকথা', 'গল্পমালা - ২', আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ, চতুর্থ মুদ্রণ, মার্চ ২০০০, পৃষ্ঠা - ৭.

৩. তদেব, পৃষ্ঠা - ১৫

৪. অভিজিৎ মিত্র ঃ 'বিরাজবালার উত্তরাধিকার', 'প্রসঙ্গ ঃ নরেন্দ্রনাথ মিত্র', সম্পাদনা -সমীর বসু,পদক্ষেপ সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ, জানুয়ারি ২০০১, পৃষ্ঠা - ২৫.

৫. ধীরেন্দ্রনাথ মিত্র ঃ 'আমাদের কথা', 'প্রসঙ্গ ঃ নরেন্দ্রনাথ মিত্র', সম্পাদনা - সমীর বসু, পদক্ষেপ সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ, জানুয়ারি ২০০১, পৃষ্ঠা - ৪.

৬. অভিজিৎ মিত্র ঃ 'বিরাজবালার উত্তরাধিকার', 'প্রসঙ্গ ঃ নরেন্দ্রনাথ মিত্র', সম্পাদনা-সমীর বসু, পদক্ষেপ সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ, জানুয়ারি ২০০১, পৃষ্ঠা - ২৫.

৭. তদেব, পৃষ্ঠা - ২৫

৮. নরেন্দ্রনাথ মিত্র ঃ 'আত্মকথা', 'গল্পমালা - ২', আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ, চতুর্থ মুদ্রণ, মার্চ ২০০০, পৃষ্ঠা - ৮.

৯. তদেব, পৃষ্ঠা - ৮

১০. তদেব, পৃষ্ঠা - ৮

১১. তদেব, পৃষ্ঠা - ৮

১২. ধীরেন্দ্রনাথ মিত্র ঃ 'আমাদের কথা', 'প্রসঙ্গ ঃ নরেন্দ্রনাথ মিত্র', সম্পাদনা - সমীর বসু, পদক্ষেপ সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ, জানুয়ারি ২০০১, পৃষ্ঠা - ৪.

১৩. নরেন্দ্রনাথ মিত্র ঃ 'আত্মকথা', 'গল্পমালা - ২', আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ, মার্চ ২০০০, পৃষ্ঠা - ১২.

১৪. সূত্র— ধীরেন্দ্রনাথ মিত্র ঃ 'আমাদের কথা', 'প্রসঙ্গ ঃ নরেন্দ্রনাথ মিত্র', সম্পাদনা - সমীর বসু, পদক্ষেপ সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ, জানুয়ারি ২০০১, পৃষ্ঠা - ৪

১৫. তদেব, পৃষ্ঠা - ১২

১৬. তদেব, পৃষ্ঠা - ১৩

১৭. অঞ্জুশ্রী ভট্টাচার্য ঃ 'নরেন্দ্রনাথ মিত্র ঃ জীবন ও সাহিত্য', পুস্তক বিপণি, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ, ১৯৯৪, পৃষ্ঠা - ৪.

১৮. নরেন্দ্রনাথ মিত্র ঃ 'আত্মকথা', 'গল্পমালা - ২', আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ, মার্চ ২০০০, পৃষ্ঠা - ১৪.

১৯. ধীরেন্দ্রনাথ মিত্র ঃ 'আমাদের কথা', 'প্রসঙ্গ ঃ নরেন্দ্রনাথ মিত্র', সম্পাদনা - সমীর বসু, পদক্ষেপ সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ, জানুয়ারি ২০০১, পৃষ্ঠা - ৬.

২০. নরেন্দ্রনাথ মিত্র ঃ 'আত্মকথা', 'গল্পমালা - ২', আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ, মার্চ ২০০০, পৃষ্ঠা - ১৫.

২১. সমীর সেনগুপ্ত ঃ 'নরেন্দ্রনাথ মিত্রের কবিতা', 'প্রসঙ্গ ঃ নরেন্দ্রনাথ মিত্র', সম্পাদনা - সমীর বসু, পদক্ষেপ সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ, জানুয়ারি ২০০১, পৃষ্ঠা - ১২৭.

২২. নরেন্দ্রনাথ মিত্র ঃ 'আত্মকথা', 'গল্পমালা - ২', আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ, মার্চ ২০০০, পৃষ্ঠা - ১৫.

২৩. তদেব, পৃষ্ঠা - ১৫

২৪. তদেব, পৃষ্ঠা - ১৫

২৫. ধীরেন্দ্রনাথ মিত্র ঃ 'আমাদের কথা', 'প্রসঙ্গ ঃ নরেন্দ্রনাথ মিত্র', সম্পাদনা - সমীর বসু, পদক্ষেপ সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ জানুয়ারি ২০০১, পৃষ্ঠা - ৬.

নরেন্দ্রনাথ মিত্রের ছোটগল্প থেকে যে সকল পংক্তি উদ্ধার করা হয়েছে সে সকল অভিজিৎ মিত্র সম্পাদিত ও নরেন্দ্রনাথ মিত্র রচিত, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড কর্তৃক প্রকাশিত নরেন্দ্রনাথ মিত্রের গল্পমালা ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭ এবং নরেন্দ্রনাথ মিত্রের কিশোর গল্প সমগ্র থেকে গৃহিত।